গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ১৮ সংখ্যা | ১৩ - ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ভারতের জনগণের উদ্দেশে বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের আবেদন

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সে দেশের বিশিষ্ট নাগরিকরা ৫ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে দুই দেশের জনসাধারণকে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিটি প্রকাশ করা হল।

আমরা এমন এক সংকটপূর্ণ সময়ে অবস্থান করছি, যখন ভারত ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক শোচনীয় অবস্থায় এবং কিছু ভারতীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির ক্রমাগত উস্কানি এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে চিড় ধরাতে চাইছে। ফলে একটা আশঙ্কা ও উদ্বেগের মধ্যেই আপনাদের কাছে আমাদের এই বক্তব্যটি তুলে ধরছি। ভারতের জনগণ ও ভারত সরকারকে আমরা কখনওই এক করে দেখি না। আমরা জানি, ভারতের জনগণও হিন্দুত্ববাদী শক্তি আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়ছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামি লিগের শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন লড়াই করে তার পতন ঘটিয়েছি আমরা। জুলাই-আগস্টের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের সময়, আপনারা আমাদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে কর্মসূচি পালন করেছেন। আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আপনাদের আর আপনাদের আন্দোলনে আমাদের সংহতি প্রকাশের ধারাবাহিকতা অনেক দিনের।

সাম্প্রদায়িকতা এই উপমহাদেশের বড় সমস্যা। এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরা একসঙ্গে লড়াই করেছি। সাম্প্রদায়িকতা মানুষে মানুষে বিভাজন ঘটায়, ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি করে বিভেদ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজের অধিকার, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং জনজীবনের আরও অনেক জলজ্যান্ত সমস্যা চোখের আড়াল করার জন্য উপমহাদেশের প্রত্যেক শাসকগোষ্ঠীই সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ার কাজে লাগিয়েছে। তারা এই কৌশল খাটিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু উভয়বিধ জনগোষ্ঠীর ভোটলাভটা নিশ্চিত করতে চায়। বিশেষত রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের কালে সংখ্যালঘু জনগণের উপর হামলার ঘটনা বারবার ঘটতে দেখা যায়।

বিগত আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে দেশব্যাপী হিন্দু বাড়িঘরে হামলা, জমি দখল, মন্দির ভাঙচুর আর হতাহতের ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। গত ৫ আগস্টে গণঅভ্যুত্থানের পর সারা দেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর মন্দিরে মন্দিরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে এবারকার গণঅভ্যুত্থানের প্রেরণায় অনেক রাজনৈতিক দল হিন্দু ঘরবাড়ি ও মন্দিরাদি পাহারায় এগিয়ে আসে এবং সম্প্রীতির নতুন নতুন নজির স্থাপন করে। এ ছাড়া ভারতের জাতীয় পতাকা মাড়ানোর ঘটনায়ও এ দেশের গণতন্ত্রমনা মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমরা দেখতে পেলাম, ভারতের অনেকগুলি সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশ সম্পর্কে আসল তথ্য প্রচার করেনি, এখনও করছে

দুয়ের পাতায় দেখুন

সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা শুনলেই ভয় বিজেপির !

বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী এবং আরও দুই আইনজীবীর করা মামলায় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সমাজতান্ত্রিক' এই দুটি শব্দের অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার পক্ষেই শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছে।

বিজেপি নেতারা বলেছেন, শব্দ দুটি ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় জরুরি অবস্থার সময়ে স্বৈরাচারী কায়দায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এই সংশোধনীর দুটি শব্দ নিয়ে যাদের এত আপত্তি সেই বিজেপি নেতারা কিন্তু ওই একই ৪২তম সংবিধান সংশোধনীতে বিচারবিভাগের ক্ষমতা হ্রাস, রাজ্যের ক্ষমতা কমিয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের দায়িত্বে জনগণের জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার বিপরীতে নির্দেশমূলক নীতির নামে জনগণের ঘাড়ে 'সুশাসনের' দায় চাপানোর ব্যবস্থা ইত্যাদি স্বৈরাচারী পদক্ষেপের কোনও বিরোধিতা করেননি। কেন? এগুলি তাঁদের দলের স্বৈরাচারী শাসনের কায়দার সাথে মেলে বলেই কি তাঁরা এ নিয়ে চুপ?

৬ ডিসেম্বর কলকাতার এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তি থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত মিছিল। সেখানে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সভা হয়

যদিও সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, ১৯৫২-তে গৃহীত সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি না থাকলেও ভারতীয় সংবিধানের মূল কাঠামোর মধ্যে এর ধারণাটা মিশে আছে। ফলে পরে তা সংবিধানের প্রস্তাবনায় যুক্ত করা ভুল নয়। আদালত অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ নিয়ে তার 'ভারতীয়' ব্যাখ্যা দিয়েছে। যা অনেক দিন ধরেই শাসকদলগুলোর নেতা-নেত্রীদের মুখে শোনা যাচ্ছিল। এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার মানে দাঁড় করানো হচ্ছে— রাষ্ট্র কর্তৃক সব ধর্মকে সমান উৎসাহদান। যদিও বিজেপি রাজত্বে সেটুকুও থাকছে না। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজম শব্দটি উদ্ভবের সুনির্দিষ্ট ইতিহাস রয়েছে ও তার একটি সুনির্দিষ্ট অর্থও আছে। সেকুলারিজমের ধারণা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সৃষ্টি। সেটি এক এক দেশে এক-এক রকম হতে পারে না। তার সুনির্দিষ্ট অর্থ হল, সমস্ত অতিপ্রাকৃত শক্তির ধারণাকে অস্বীকার করা। এর ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে আছে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার কাঠামো।

ছয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লির যন্তর মন্তরে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির ধরনা

কেন্দ্রের নয়া শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে ৩ ডিসেম্বর দিল্লির যন্তর মন্তরে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির ডাকে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ধরনা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নন্দিতা নারাইন, কেরালা থেকে অধ্যাপক জর্জ যোসেফ, মধ্যপ্রদেশের অধ্যাপক সুরেন্দ্র রঘুবংশী, আসামের অধ্যাপক ঘনশ্যাম নাথ, প্রাক্তন উপাচার্য এল জহর নেশান, প্রাক্তন উপাচার্য চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, সিএসআইআর-এর বিজ্ঞানী অমিতাভ বসু, ইনসা বিজ্ঞানী ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর সহ অন্যান্যরা। জেএনইউ-এর ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আদিত্য মুখার্জীর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শাজাহার খান।

আদিত্য মুখার্জী বলেন, গত ৪০ বছর ধরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জেএনইউ-এর মতো প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, কেন্দ্রের বর্তমান শাসকরা কেবল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নয়, দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে দিতে চাইছে। তিনি বলেন, সিইউইটি এবং এনইইটি-র মতো কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে।

নন্দিতা নারাইন বলেন, ভারতীয় জ্ঞানধারার মাধ্যমে ছাত্রদের কোমল মনেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় বলেন, এই শিক্ষানীতি শিক্ষার বেসরকারিকরণ-ব্যবসায়ীকরণের নীলনক্সা। এই শিক্ষানীতি চালু হলে আর্থিকভাবে পশ্চাদপদ অংশ শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে সরে যাবে। অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার

আটের পাতায় দেখুন

বিশিষ্ট নাগরিকদের আবেদন

একের পাতার পর

না। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা রুটে ব্যবসারত একটি বাণিজ্যিক পরিবহণের এক বাস ৩০ নভেম্বর, শনিবার, দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বাসটি সড়কপার্শ্বের এক ভ্যানে ধাক্কা দেয়। ভারতের এক সংবাদমাধ্যম এই দুর্ঘটনাকে পরিকল্পিত হামলা বলে প্রচার করে। সেই প্রচারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আগরতলাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে আক্রমণ হয়, বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়। এই ঘটনায় ভারত সরকার দুঃখপ্রকাশ করে। কিন্তু ওই ধরনের মিথ্যা প্রচারণা বন্ধের কোনও কার্যকর উদ্যোগ তারা নেননি। (আমরা চাই, বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনা যথাযথ দেখানো হোক।) এ ধরণের প্রচারণা থেকে যে কোনও দেশেই লাভবান হয় সাম্প্রদায়িক শক্তি, লাভবান হয় শাসকগোষ্ঠী। এরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় বসতে চায়।

সম্প্রতি চিন্ময়কৃষ্ণ দাস গ্রেফতার হওয়ার পর ভারত সরকার যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে তা আমাদের অবাক করেছে। উনি ভারতের নাগরিক নন। তার বিরুদ্ধে ইসকনের অভ্যন্তরেই অভিযোগ ছিল এবং সেই প্রাতিষ্ঠানিক তদন্ত প্রক্রিয়াকে চিন্ময়কৃষ্ণ বাধাগ্রস্ত করে উল্টো ইসকনের বিরুদ্ধেই মামলা করেছিলেন। সে কারণে ইসকন তাকে বহিষ্কার করে। চিন্ময়কৃষ্ণের বিচার পাওয়ার অধিকারকে আমরা সমর্থন করি, সেটা সকলেরই আছে। কিন্তু ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যেভাবে তড়িঘড়ি তাঁর পক্ষে বিবৃতি দান করল— তা বিস্ময়কর। তাঁকে আদালতে উপস্থিত করার দিন ব্যাপক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে হত্যা করা হয়। এ দেশের জনমানুষের সম্মিলিত চেষ্টায় এই ঘটনার অজুহাতে বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আমরা বলতে চাই, হিন্দুদের কিছু ধর্মীয় সংগঠন সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে না। হিন্দু সম্প্রদায় থেকে অনেকেই এ ধরনের সাম্প্রদায়িক প্রচারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। সর্বশেষ ত্রিপুরায় বাংলাদেশের উপ হাইকমিশনে আক্রমণের বিরুদ্ধেও হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে আলাদা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। এইসব বিক্ষোভে এ দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীও বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠী বরাবরই অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে। এ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং সকল ধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভূমিকা উজ্জ্বল। জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানেও হিন্দু জনসাধারণের অনেকেই লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। অনেক ভারতীয় প্রচারমাধ্যম এই গণঅভ্যুত্থানকে ইসলামি মৌলবাদের বিজয় বলে অভিহিত করেছে। বাংলাদেশের হিন্দুরা তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। লড়াইয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা বাঁধনটা এ দেশে এখনও অটুট আছে। এ দেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড নেই এমন নয়, কিন্তু তাবত জনগোষ্ঠীর ঐক্যই তা রোধ করার একমাত্র উপায় ।

আমাদের দুই দেশের জনগণের সমস্যা গোড়ায় একই জিনিস। এই সমস্যার সমাধান সাম্প্রদায়িক সংঘাতে কিংবা সংঘর্ষে পাওয়া যাবে না, হিন্দু-মুসলমান উত্তেজনায় এর সমাধান নিহিত নেই। সাধারণ জনগণের জীবন-সংকট বিচার করলে দু'দেশের মধ্যে মূলত কোনও পার্থক্য নেই।

আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক প্রবণতা আর শক্তির বিরুদ্ধে আমরা লড়ব, আপনারাও আপনাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। আপনাদের দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, গণঅভ্যুত্থানে যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের আকাঙ্খার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে আপনারা এই চক্রান্ত প্রতিহত করবেন।

এ লড়াই ভারতের বৃহৎ পুঁজির শোষণ-লুণ্ঠন আর নিপীড়ন-নির্যাতন-আধিপত্যের বিরুদ্ধে উভয় দেশের জনগণের নিরন্তর লড়াই। বিভেদ, বিদ্বেষ আর ধর্মকেন্দ্রিক স্বার্থান্বেষী চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই। লড়াই এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা আমরা করি। এই লড়াইয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হব।

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন—

১. অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ
২. অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান
৩. সাঈদ ফেরদৌস, উপ-উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
৪. অধ্যাপক ডা. হারুন-অর-রশীদ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
৫. স্বাধীন সেন, অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৬. কামরুল হাসান মামুন, অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭. তুহিন ওয়াদুদ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
৮. সায়ান, সঙ্গীত শিল্পী ও মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী
৯. প্রীতম দাশ, কেন্দ্রীয় সদস্য, জাতীয় নাগরিক কমিটি
১০. দীপ্তি দত্ত, শিক্ষক, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১১. সৌম্য সরকার, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ১২. সামিনা লুৎফা নিত্রা, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩. আলতাফ পারভেজ, লেখক ও সাংবাদিক, ১৪. সারোয়ার তুষার, লেখক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সদস্য, জাতীয় নাগরিক কমিটি, ১৫. আশরাফ কায়সার, গণমাধ্যমকর্মী, ১৬. ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট, ১৭. মানজুর আল মতিন, আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট, ১৮. খোকন দাস, লেখক ও সাংবাদিক, ১৯. বীথি ঘোষ, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক সংগঠক, ২০. রেহনুমা আহমেদ, লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট, ২১. গীতি আরা নাসরীন, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২২. মেঘমল্লার বসু, সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ২৩. সুব্রত সরকার, স্থপতি, ২৪. সুরেশ বাসফোর, সভাপতি, হরিজন অধিকার আদায় সংগঠন, ২৫. কল্লোল মোস্তফা, লেখক, ২৬. জি এইচ হাবীব, অনুবাদক ও সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২৭. পারভেজ আলম, লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট, ২৮. মাহা মির্জা, লেখক ও গবেষক, ২৯. ডাঃ জয়দীপ ভট্টাচার্য, চিকিৎসক, ৩০. কামার আহমাদ সাইমন, চলচ্চিত্র নির্মাতা, ৩১. অনীক রায়, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মী, ৩২. অমিতাভ রেজা চৌধুরী, চলচ্চিত্র নির্মাতা, ৩৩. কামাল চৌধুরী, অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৪. মোশাহিদা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৫. সায়দিয়া গুলরুখ, সাংবাদিক, ৩৬. ব্যারিস্টার ওমর ফারুক, আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট, ৩৭. সীমা দত্ত, নারীনেত্রী, সভাপতি, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, ৩৮. ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা, সংস্কৃতিকর্মী, ইনচার্জ, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ৩৯. মামুন আল রশীদ, শিক্ষক, স্কলার্স ইউনিভার্সিটি, ৪০. আর রাজি, শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৪১. শর্মি বড়ুয়া, প্রভাষক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪২. জহিরুল ইসলাম কচি, সভাপতি, বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরাম, ৪৩. ড. সিউতি সবুর, সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান, ব্লাক ইউনিভার্সিটি, ৪৪. ধ্রুব দাশ, স্বাধীন গবেষক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা, ৪৫. ডাঃ মোঃ আরিফ মোর্শেদ খান, সহযোগী অধ্যাপক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, অ্যাক্টিভিস্ট, ৪৬. জান্নাতুল মাওয়া, আলোকচিত্রী, অ্যাক্টিভিস্ট, ৪৭. আসিফ মোহাম্মদ শাহান, অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৮. ফাতেমা শুভ্রা, সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৯. ফাহমিদুল হক, লেখক-গবেষক-শিক্ষক, ৫০. হাসান তৌফিক ইমাম, সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৫১. অলিউর সান, শিক্ষক, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, ৫২. মনির হোসেন, শিক্ষক, বাংলাদেশ ব্যবসা ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বিইউবিটি), ৫৩. আব্দুল্লাহ হারুন চৌধুরী, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৪. কাজলী সেহরীন ইসলাম, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৫. রাইয়ান রাজী, শিক্ষক, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৬. জায়েদা শারমিন, অধ্যাপক, পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৭. শেহরীন আতাউর খান, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৮. আরাফাত রহমান, সহকারী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৯. খাদিজা মিতু, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৬০. সিরাজাম মুনিরা, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, ৬১. মির্জা তাসলিমা সুলতানা, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ৬২. শেখ নাহিদ নিয়াজী, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ৬৩. শরমিন্দ নীলোর্মি, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ৬৪. বখতিয়ার আহমেদ, অধ্যাপক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ, ৬৫. নাসির আহমেদ, শিক্ষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ৬৬. মাহমুদুল সুমন, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ৬৭. সামিও শীশ, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস (সিএআরএএসএস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৬৮. রুশাদ ফরিদী, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৬৯. সৈয়দ নিজার আলম, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ৭০. ড.রেজওয়ানা স্নিগ্ধা, শিক্ষক, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ৭১. ডা.মো. আরিফ মোর্শেদ খান, সহযোগী অধ্যাপক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, অ্যাক্টিভিস্ট, ৭২. হানিয়্যুম মারিয়া খান, জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, পরিবেশ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ৭৩. ডা. শামীম তালুকদার, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-এমিনেন্স, সমন্বয়ক-সন্তান ও অভিভাবক ফোরাম, ৭৪. আফজাল হোসেন, অ্যাক্টিভিস্ট, ৭৫. রাফসান আহমেদ, চলচ্চিত্র কর্মী, ৭৬. ইমেল হক, নির্মাতা, ৭৭. বাকী বিল্লাহ, লেখক ও রাজনৈতিক কর্মী, ৭৮. অনুপম সৈকত শান্ত, লেখক ও গবেষক, ৭৯. রবিউল করিম নান্টু, ব্যবসায়ী ও সংগঠক, ৮০. সালমান সিদ্দিকী, সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ৮১. ফেরদৌস আরা রুমী, কবি ও অধিকার কর্মীস, ৮২. মাসুদ রেজা, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, ৮৩. সজীব তানভীর, স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা, ৮৪. লাবণী মণ্ডল, সাহিত্য সমালোচক, রাজনৈতিক কর্মী, ৮৫. শাহেরীন আরাফাত, সাংবাদিক, ৮৬. তসলিমা আকতার বিউটি, রাজনৈতিককর্মী, ৮৭. ডাঃ নাজমুস সাকিব, ডেন্টাল সার্জন, ৮৮. জাকিয়া শিশির, মানবাধিকার কর্মী এবং রাজনৈতিক কর্মী, ৮৯. রাশেদ শাহরিয়ার, রাজনৈতিক কর্মী, ৯০. শহীদুল ইসলাম সবুজ, শ্রমিক নেতা ও সাধারণ সম্পাদক, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম, ৯১. তানিয়াহ মাহমুদা তিন্নি, শিক্ষক, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ৯২. ডাঃ সারা আহমেদ, চিকিৎসক, ৯৩. আকরাম খান, চলচ্চিত্রকার, ৯৪.গোলাম সারওয়ার, শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৯৫. রজত হুদা, রাজনৈতিক কর্মী, ৯৬. মাহতাব উদ্দীন আহমেদ, গবেষক ও অ্যাক্টিভিস্ট, ৯৭. মারজিয়া প্রভা, অ্যাক্টিভিস্ট, ৯৮. কামরুজ্জামান রিপন, উন্নয়নকর্মী, ৯৯. অ্যাডভোকেট পলাশ কান্তিনাগ, সদস্য সচিব, রংপুর মহানগর নাগরিক কমিটি, ১০০. মীর হুযাইফা আল মামদূহ, গবেষক, ১০১. মোশাররফ হোসেন, প্রকৌশলী, ১০২. সৈকত দে, কবি ও লেখক, ১০৩. ইসহাক সরকার, শিক্ষক, ১০৪. গোলাম সারওয়ার, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৫. সুদীপ্ত বিশ্বাস, লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট, ১০৬. দোলন প্রভা, কবি ও লেখক, ১০৭. তাওফিকা প্রিয়া, সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত), বিপ্লবী ছাত্র-যুব আন্দোলন, ১০৮. জাফর হোসেন, সভাপতি, নয়াগণতান্ত্রিক গণমোর্চা, ১০৯. মুতাসিম আলী, কবি ও লেখক, ১১০. কাজী শাহীদুল ইসলাম, নাট্যকার, ১১১. বিপ্লব ভট্টাচার্য, আহ্বায়ক, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন, ১১২. আবু রায়হান, সংস্কৃতিকর্মী, ১১৩. মানস নন্দী, সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, ১১৪. মনীষা মাফরুহা, উন্নয়নকর্মী, ১১৫. মতিন সরকার, আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট, ১১৬. নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, ১১৭. সুশান্তসিনহা সুমন, সদস্য সচিব, গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলন, কেন্দ্রীয় কমিটি, ১১৮. মাসুদ খান, সভাপতি, জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ, ১১৮. নাসির উদ্দীন আহম্মদ নাসু, রাজনৈতিক কর্মী, ১২০. ডাঃ মজিবুল হক, আহ্বায়ক, হেলথ সার্ভিস ফোরাম, ১২১. মাহির আহনাফ হোসেন, শিক্ষার্থী, ১২২. উম্মে ফারহানা সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১২৩. এহসান হাবিব, কবি ও সম্পাদক, অবরুদ্ধ সময়ের কবিতা, ১২৪. জানে রোমান রোজারিও তালুকদার, গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলন কর্মী, ১২৫. মোশরেফা মিশু, রাজনৈতিক কর্মী, ১২৬. তাহমিনা ইয়াসমিন নীলা, রাজনৈতিক কর্মী, ১২৭. অধ্যাপক কাজী ফরিদ, গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ১২৮. সরকার আজিজ, কবি, ১২৯. অধ্যাপক ডা. কাজী রকিবুল ইসলাম, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, ১৩০. এ.বি.এম. জাকারিয়া, ব্যবসায়ী, ১৩১. মুসলিম বিন হাই, আইনজীবী ও সভাপতি, সচেতন অভিভাবক সমাজ, ১৩২. রায়হান কবির, ব্যবসায়ী, ১৩৩. মোহাম্মদ সেলিম, আইনজীবী ও সাধারণ সম্পাদক, সচেতন অভিভাবক সমাজ, ১৩৪. ইকবাল খান, সংস্কৃতিকর্মী, ১৩৫. সিরাজুম মনির, ব্যবসায়ী, ১৩৬. আবদুল্লাহ ক্বফী রতন, রাজনৈতিক কর্মী, ১৩৭. মাসুদ রানা, সমন্বয়ক, বাসদ (মার্ক্সবাদী), ১৩৮. মোশাররফ হোসেন নান্নু, রাজনৈতিক কর্মী, ১৩৯. ইকবাল কবীর জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক, বিপ্লবী কমিউনিস্টলিগ, ১৪০. আব্দুস সাত্তার, রাজনৈতিক কর্মী, ১৪১. ডাঃ তন্ময় সান্যাল, ডেন্টাল সার্জন, ১৪২. সুস্মিতা রায় সুপ্তি, সংস্কৃতিকর্মী, ১৪৩. স্নেহাদ্রি চক্রবর্ত্তী, আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট, ১৪৪. ডাঃ মহিউদ্দিন আহমদ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ১৪৫. ধ্রুবজ্যোতি হোর, শিক্ষাকর্মী

ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস স্মরণ

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, মানবসেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক দ্বারকানাথ কোটনিসের মৃত্যু হয় ১৯৪২ সালের ৯ ডিসেম্বর। তাঁর স্মরণে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন নদিয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৭ ডিসেম্বর রানাঘাট সরকার লজে তাঁর ৮৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। তিনি দ্বিতীয় চিন-জাপান যুদ্ধের সময় চিনের মানুষকে চিকিৎসা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে যান, বিপদ মাথায় করে অক্লান্ত ভাবে মানুষের সেবা করেন। সেখানেই মাত্র ৩২ বছর বয়সে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। চিন ও ভারতের মানুষ তাঁকে আজও শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। স্মরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ অপূর্ব কুমার রায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডাঃ সত্যজিৎ রায়। তাঁরা বক্তব্যও রাখেন। উপস্থিত সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তমলুকে খাল সংস্কারের দাবিতে কনভেনশন

দীর্ঘ আন্দোলনের পর তমলুক ব্লকের পায়রাটুঙি খাল সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। ওই খাল সংস্কারের দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে 'তমলুক ব্লক কৃষক সংগ্রাম কমিটি'। এ বারের বর্ষায় খাল সংস্কার না হওয়ায় বহুদিন জমা জলের দুর্ভোগ সহ্য করতে বাধ্য হন এলাকাবাসী। দ্রুত খাল সংস্কার ও খালের সাথে যুক্ত নাসা খালগুলি পূর্ণ সংস্কারের দাবিতে ২৩ নভেম্বর তমলুকের কেলোমাল সন্তোষিনী হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনে এলাকার ভুক্তভোগী শতাধিক মানুষ যোগ দেন। বক্তব্য রাখেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক। সভাপতিত্ব করেন সভাপতি সুদর্শন সামন্ত। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সম্পাদক শশাঙ্ক আদক, চিন্তামণি মাইতি, শম্ভু মান্না প্রমুখ।

সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির কুম্ভীরাশ্রুতে বিভ্রান্ত হবেন না

ভারত ও বাংলাদেশ এক সময় একটি দেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুই দেশের সাধারণ মানুষের মতামতের বিরুদ্ধে গিয়েই সাম্রাজ্যবাদী শাসক ইংরেজ এবং হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির ষড়যন্ত্রে ঘটেছিল দেশবিভাগ। ভারত ও বাংলাদেশের অবস্থান পাশাপাশি হওয়ায়, বাংলাদেশ এবং এই পশ্চিমবঙ্গে ভাষা এক হওয়ায় এবং উভয় ধর্মের মানুষেরই উভয় দেশে আত্মীয়-স্বজন থাকায় দেশবিভাগের তিক্ততাকে অতিক্রম করে অর্থনৈতিক লেনদেনের পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

মাত্র চার মাস আগে গত আগস্টে সারা বিশ্বের মানুষ দেখল, বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা এক ঐতিহাসিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কী ভাবে ফ্যাসিবাদী আওয়ামি লিগ সরকারকে গদিচ্যুত করল। কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ধীরে ধীরে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং পরে তা সরকার বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়। আওয়ামি লিগ সরকার সেই আন্দোলনকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয় না। হাসিনা সরকারের পতন হয় এবং শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে ভারত সরকারের আশ্রয় নেন। এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ছাত্র জনতা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করেছে, জেলে গিয়েছে, গুলিতে প্রাণ দিয়েছে।

• বাস্তবে বাংলাদেশের নাগরিকদের একটি ছোট অংশই শুধু মৌলবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত। বাকি অধিকাংশ নাগরিকই অন্য ধর্মের দেশবাসীর প্রতি আদৌ বিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে চলেন না। ঠিক যেমন ভারতের হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যগরিষ্ঠ অংশেরই দেশের মুসলমান নাগরিকদের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই।

কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই দেখা গেল বাংলাদেশের পরিবেশ খানিকটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণের কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে এবং সেগুলিকে শতমুখে প্রচার করে 'বাংলাদেশে হিন্দুরা বিপন্ন' ধুয়া তুলে প্রবল শোরগোল ফেলেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ও সোসাল মিডিয়া এবং এ দেশের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি। এই প্রচারে প্রভাবিত হয়ে পড়ছে এ দেশের বহু মানুষ। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নানা সূত্রে উঠে আসছে অন্য ছবি।

বাস্তবে এই আন্দোলন যেহেতু ছিল স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে এবং আন্দোলনের উপর যেহেতু হাসিনা সরকার নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল, তাই বিজয়ের পর জনগণের রোষ গিয়ে পড়ে হাসিনার দল আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীদের উপর— যাঁদের অনেকেই আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচারে হাত লাগিয়েছিল। এই নেতা-কর্মীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের মানুষই আছে। কিন্তু বাংলাদেশ যেহেতু মুসলিম প্রধান তাই হিন্দু আওয়ামি লিগ নেতা-কর্মীদের উপর প্রতিশোধের মনোভাবকে হিন্দুদের উপর আক্রমণ হিসাবে দেখাতে শুরু করে বাংলাদেশের হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনগুলি। ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি তাদের সুরে সুর মেলায়। পাশাপাশি, বিরোধী জামায়াতে ইসলাম এবং বিএনপি ইসলামপন্থী রাজনীতির চর্চা করায় বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ মূলত ছিল আওয়ামি লিগের সমর্থক— ঠিক যেমন ভারতে সংখ্যালঘু অংশের মানুষ হিন্দুত্ববাদী বিজেপির বিরোধী শাসক দলগুলিকেই সমর্থন করে। এই অবস্থায় বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মৌলবাদী সংগঠনগুলি নিজেদের সক্রিয় করে তুলতে এবং জনমনে জায়গা করতে আওয়ামি লিগ বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে সে দেশের হিন্দুদের আক্রমণের নিশানা করে। যদিও এ কথা সত্যি যে, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন সে দেশে গণতান্ত্রিক দাবিগুলিকে সামনে রেখে যে ভাবে লড়াই করেছে, তা উভয় ধর্মের মানুষের মধ্যে একটা ঐক্যের বাঁধন তৈরি করে দিয়েছে। সেই বাঁধনটাই সংখ্যাগুরু মৌলবাদীদের এই আক্রমণকে অনেকখানি সংযত থাকতে বাধ্য করেছে। দেখা গেছে, মৌলবাদীদের আক্রমণ রুখতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রমঞ্চের সদস্যরা রাত জেগে হিন্দুদের মন্দির এবং ব্যবসা-সম্পত্তি পাহারা দিয়েছে। এটি একটি লক্ষণীয় ইতিবাচক দিক।

বাংলাদেশের হিন্দুদের আওয়ামি লিগকে সমর্থন করার মানে এই ছিল না যে, আওয়ামি লিগ সরকার হিন্দুদের স্বার্থের রক্ষক। বাস্তবে হিন্দুদের এই সমর্থনকে আওয়ামি লিগ ভোটব্যাঙ্ক হিসাবেই কাজে লাগিয়েছে। আবার যখন তার সংখ্যাগুরু ভোটব্যাঙ্কে ফাটল দেখা দিয়েছে তখন অনায়াসে হিন্দু মন্দিরের উপর আক্রমণ, দুর্গাপুজোয় বাধা দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে দিয়ে একদিকে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক রক্ষা করেছে, অন্য দিকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ত্রাতা হিসাবে নিজেকে হাজির করেছে। ঠিক যে ঘটনা স্বাধীনতার পর থেকে ভারতেও ঘটে চলেছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় সংখ্যলঘুরা কংগ্রেসকে সমর্থন করলেও কংগ্রেস শাসনে দেশে নানা সময়ে ছোট-বড় অসংখ্য দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে। দেখা গেছে, সেগুলিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন কংগ্রেস নেতারাই। কংগ্রেস প্রকাশ্যে বলেছে, এত দিন তারা সংখ্যালঘুর রাজনীতি করেছে, এখন সংখ্যাগুরুর রাজনীতি করবে। অর্থাৎ হিসাবটা ভোটের। এ রাজ্যে যত দিন সিপিএম শাসনক্ষমতায় ছিল, রাজ্যের সংখ্যালঘুরা তাদেরই সমর্থক হিসাবে পরিচিত ছিল। শাসক দলের বদল ঘটতেই এই সমর্থন বদলে তৃণমূল কংগ্রেসের ঝুলিতে আসে। তার মানে এই নয় যে, এই সব শাসক দলগুলি সংখ্যালঘুদের হিতাকাঙ্খী। দীর্ঘ ৩৪ বছর এ রাজ্যে সিপিএম ক্ষমতায় থাকার পরও সংখ্যালঘুদের আর্থিক অবস্থা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কোন তলানিতে পৌঁছেছিল ২০০৬ সালে সাচার কমিশনের রিপোর্ট তা প্রকাশ্যে এনেছিল। তৃণমূল শাসনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আসলে পুঁজিবাদী শাসনে সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু প্রত্যেকেই শোষিত-বঞ্চিত।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে উপলক্ষ করে এ রাজ্যে বিজেপি নেতাদের ভয়ঙ্কর রকমের সক্রিয় হয়ে ওঠার ঘটনা কারও চোখ এড়ায়নি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এ নিয়ে যতটা না সক্রিয় এ রাজ্যের বিজেপি নেতারা সে দেশের সংখ্যালঘু-স্বার্থের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে নিজেদের তুলে ধরতে এবং এ রাজ্যে হিন্দু ভোটকে সংহত করতে তার থেকে বেশি সক্রিয় হয়ে পড়েছে। রাজ্যের এক শীর্ষ নেতা তো এমনকি পেট্রাপোল সীমান্তে সভা করে দুই দেশের আর্থিক লেনদেন

চারের পাতায় দেখুন

অন্ধকার কিছু নয় আলোর অভাব মাত্র

তৃণমূল নেতা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দেদার চুরি-দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন জেলেও গিয়েছে। সম্প্রতি আর জি করের নারকীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও নাগরিক আন্দোলন চলছে। তবু তারা একের পর এক ভোটে জিতছে। ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও তারা বিপুল ভোটে জিতল। এর কারণ কী?

—প্রশ্নটা চা দোকানদার রতনের। রিটায়ার্ড বিমলদা তার রেগুলার কাস্টমার। তিনি তখন চা শেষ করে নস্যি নিচ্ছিলেন। তড়িঘড়ি রুমাল দিয়ে নাক মুছে জবাব দিলেন, 'একেই বলে মমতা ম্যাজিক, বুঝলে?' রতন ঠিক স্বস্তি পেল না। ওভেনের আঁচটা একটু কমিয়ে দিয়ে স্থির পলকে বিমলদার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে উনি ফের বললেন, 'আসলে কী জানেন, ওসব চুরি, দুর্নীতি, ধর্ষণ, মূল্যবৃদ্ধি —এখন আর কোনও সিরিয়াস ইস্যুই নয়। মানুষ সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে, সিপিএম কংগ্রেস তৃণমূল নামে আলাদা হলেও কাজ তারা একই করে, জনতাকে ঠকায়। ভেবে দেখ দেখি, বিজেপি কী করে ভোট পায়! ওটার মতো কোরাপ্ট পার্টি আর আছে? কোরাপশনের জন্য ওদের তো নোবেল দেওয়া উচিত। শুধু এরাই নয়। একটু খোঁজ নিলেই দেখবে, এখন ঠগ বাছতে শুধু গাঁ নয়, পুরো দেশটাই উজাড় হয়ে যাবে। ফলে, ওগুলো কোনও ইস্যু না।' রতন জানতে চাইল, কিন্তু 'আর জি কর?' বিমলদা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঘটনা মারাত্মক। সেজন্য তৃণমূল সরকারের দুর্নীতিপরায়ণতাই মূল দায়ী। কিন্তু উপায় কী? রাজনীতি এখন ডোলের কোলে দোল খাচ্ছে। জীবন-জীবিকায় জেরবার মানুষ ডাইরেক্ট বেনিফিশিয়ারি স্কিমের গ্রাসে চলে যাচ্ছে। আর জি কর নিয়ে চাপে পড়ে মমতা তবু কিছুটা আলাপ-আলোচনার পথে গেছে, জ্যোতিবাবু তো জুনিয়র ডাক্তারদের পুলিশ এবং পার্টির মাস্তান পাঠিয়ে বেধড়ক পিটিয়েছিলেন।

রতন জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে ইস্যুটা কী?' উত্তর এল, 'ইস্যু কিছু নেই। জোর যার মুলুক তার। যে যত বড় উন্নয়নের কাণ্ডারী সাজতে পারবে, কুর্সি তার।' রতন একটু হতাশ সুরে বলল, 'তাহলে এসব অন্যায়ের কোনও প্রতিকার নেই বলছেন?' বিমলদা খুব সহজেই জবাব দিলেন, 'আলবাত আছে। যেদিন এ ধরনের দলগুলো ধ্বংস হবে সেদিন চুরি-দুর্নীতি-ধর্ষণ সব বন্ধ হবে।' রতন হাসার চেষ্টা করল। বিমলদা বললেন, 'মনে রেখো, নেহেরুর মতো শিক্ষিত ভদ্রলোকও কিন্তু চুরি-দুর্নীতির সঙ্গে অনায়াসে আপস করেছেন। এমনকি দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের মন্ত্রীসভাতেও ঠাঁই দিয়েছেন। তিনিও শিল্পপতিদের থেকে অকাতরে পার্টি ফান্ডে টাকা নিয়েছেন, তাদের সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন। তিনিও ভোটে জিততে বারবার জনতাকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই পথেই কংগ্রেস রাজত্ব করেছে, শাসন শোষণ চালিয়েছে। খুন-খারাপি দাঙ্গা দুর্নীতি সব করেছে। আগে এত সহজে জানা যেত না, এখন অনেক কিছু জানা যায়, পার্থক্য এটুকুই।'

প্রৌঢ় স্বপনদা পেপারটা ভাঁজ করে রেখে বললেন, 'মুড়ি মিছরি এক করবেন না তো। সিপিএম আমলে এসব হয়নি। আমাদের নেতারা কেউ চোর নয়। ইলেক্টোরাল বন্ডে আমরা টাকা নিয়েছি?' বিমলদা হেসে বললেন, 'কোনটা হয়নি সিপিএম আমলে ভাই? তাছাড়া, টাকা চুরি তো নেহাত সহজ কাজ হে। তোমরা তো কতগুলো প্রজন্মের ভবিষ্যতই চুরি করে নিয়েছ। এ অপরাধ কী মারাত্মক, বোঝো তা? সরকারি শিক্ষার সর্বনাশ করে মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া শুরু করেছিল কারা? তার সাথে রান্নাঘর থেকে রাইটার্স পর্যন্ত দলতন্ত্রের বিষও তোমরাই আমদানি করেছ। কন্ট্রাক্টর, প্রোমোটার রাজের হোতা কারা? বিরোধীদের কীভাবে তোমরা মারতে, খুন করতে, কীভাবে ভোট লুঠ করতে সেসব কি মানুষের অজানা? ক্ষমতা হারিয়ে এখন সাধু সাজতে চাইলে হবে? কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়েকে ফেসবুকে বিপ্লবী সাজিয়ে প্রেজেন্ট করছ, যেদিন ওরা তোমাদের ইতিহাস জানবে সেদিন ঘেন্না করবে তোমাদের, মিলিয়ে নিও। আর, ইলেক্টোরাল বন্ডে এখনও টাকা নাওনি ঠিকই কিন্তু কর্পোরেট ফান্ড ঝুলি ভরে নিচ্ছ। কাদের স্বার্থে? মানুষ বোঝে না? এমনি এমনি তোমরা শূন্য হয়েছ ভাবো? পিকে ডেকেও শিকে ছিঁড়বে না, জেনে রেখো।'

স্বপনদা বললেন, 'ভিত্তিহীন কথা বলে কী লাভ? আপনার কাছে কোনও প্রমাণ আছে?' বিমলদা মুচকি হেসে বললেন, 'ভাই, নিজেরাই জানো তোমরা প্রমাণ তো আছেই, প্রমাণ থাকে না। এলাকায় এলাকায় স্কুল-কলেজগুলোতে তোমাদের আমলে কত যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হয়ে অযোগ্যরা ঢুকে বসে আছে, তা কি তোমরা জান না? সাজিয়ে প্রমাণ রেখে অপরাধ করে শখের গোয়েন্দা গল্পের

সাতের পাতায় দেখুন

এআইএমএসএস-এর দার্জিলিং জেলা সম্মেলন

এআইএমএসএস-এর ৫ম দার্জিলিং জেলা সম্মেলন হল ৯ সেপ্টেম্বর। শুরুতে একটি সুসজ্জিত মিছিল এয়ারভিউ মোড় থেকে শুরু হয়ে বাঘাযতীন পার্কে এসে শেষ হয়। সেখানে প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্ত্বনা দত্ত। জিটিএস ক্লাব হলে প্রতিনিধি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড শিখা নন্দীকে সভাপতি, কমরেড লুৎফা খাতুনকে সম্পাদক এবং কমরেড সুপ্রীতি পালকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৫ জনের জেলা কমিটি সহ মোট ২৮ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

লঞ্চের ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদ

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ডায়মন্ডহারবার পৌরপ্রধান ১ ডিসেম্বর থেকে হুগলি নদীতে ফেরি-ভাড়া চড়া হারে বৃদ্ধির ঘোষণা করেছেন। সাধারণ যাত্রীভাড়া বেড়েছে ৭ টাকা। বড় মালের টিকিট বেড়েছে ১০ টাকা, ছাত্রছাত্রীদের টিকিট মাসে ৫০ টাকা বাড়ছে। কুঁকড়াহাটি-ডায়মন্ডহারবার রুটে লঞ্চ-ভেসেলের এই অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক ফেরিভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে ২৭ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক, হলদিয়া ও ডায়মন্ডহারবারের মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয় পরিবহণ যাত্রী কমিটি।

মহকুমা ফেরি-যাত্রী কমিটির পক্ষ থেকে পরিবহণমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য ২৮ নভেম্বর কুঁকড়াহাটি ফেরিঘাটে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। ২৯ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী, পরিবহণ ও পৌরমন্ত্রী, পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসক ও সুতাহাটার বিধায়ককে স্মারকলিপি দেয় কমিটি। ২৬ নভেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে ডায়মন্ডহারবার এবং হলদিয়ার মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করা না হলে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ জানান।

পঞ্চায়েতি ট্যাক্সবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

২৯ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের শান্তিপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদে শতাধিক মানুষ পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ দেখান ও স্মারকলিপি দেন। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বাড়ি ও সম্পত্তির উপর বর্তমান বাজারমূল্যে ২-৬ শতাংশ ট্যাক্স নির্ধারণ করার জন্য ফর্ম বিলি করা হয়েছে। বাড়ি মালিকের স্বাক্ষর সহ সেই ফর্ম প্রধানের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে। এই অস্বাভাবিক করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এলাকার মানুষজন মাইকপ্রচার করে আন্দোলনের আহ্বান জানান। পঞ্চায়েত প্রধান মানুষের ক্ষোভ আঁচ করে এই ফর্ম বিলি করা ভুল হয়েছে স্বীকার করে জানান, ট্যাক্স আদায় করা হবে না। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন প্রবোধ সী, কার্তিক আচার, স্বপন দাস, কার্তিক বেরা প্রমুখ। তাঁরা বলেন, ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টা হলে তীব্র প্রতিরোধ হবে।

কুম্ভীরাশ্রুতে বিভ্রান্ত হবেন না

তিনের পাতার পর

বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। যদিও দুই দেশের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান একই রকম ভাবে চলছে এবং ভারত সরকার এমন কোনও ইঙ্গিত এখন পর্যন্ত দেয়নি। এই নেতারাই এ দেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা তৈরির লক্ষ্যে অবিরত বিষোদগার করে চলেছেন। এ দেশে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি প্রভৃতি যে সব সমস্যাগুলি ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের জীবনকে জেরবার করে দিচ্ছে তা নিয়ে এই নেতাদের টুঁ শব্দ করতে দেখা যায়নি। সম্প্রতি আর জি করে চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের বিরুদ্ধে এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দুর্নীতি ও থ্রেট সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে গোটা রাজ্য উত্তাল হয়ে উঠলেও এই সব নেতাদের তাতে সামিল হতে দেখা যায়নি। প্রথম দিকে এই গণআন্দোলনকে সরকার বিরোধী আন্দোলনে পরিণত করে ক্ষমতায় যাওয়ার রাস্তা প্রশস্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে রণে ভঙ্গ দেন তাঁরা। তাঁরাই আজ বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিকে পুঁজি করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে নেমে পড়েছেন। বাংলাদেশে হিন্দুদের একাংশ যে আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছেন, তাকে সে দেশের হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের আক্রমণ হিসাবে প্রচার করছেন। অথচ বাস্তবে বাংলাদেশের নাগরিকদের একটি ছোট অংশই শুধু মৌলবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত। বাকি অধিকাংশ নাগরিকই অন্য ধর্মের দেশবাসীর প্রতি আদৌ বিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে চলেন না। ঠিক যেমন ভারতের হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যগরিষ্ঠ অংশেরই দেশের মুসলমান নাগরিকদের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই। বিজেপিকে যাঁরা ভোট দেন তাঁরাও এমনকি বিজেপির হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের অনুগামী নন। তাঁদের বেশির ভাগই সাধারণ মানুষ, যারা দু-বেলা দু-মুঠো খাবারের সন্ধান করতেই বেশি ব্যস্ত থাকেন— হিন্দুত্ববাদ নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় তাঁদের নেই।

মনে রাখতে হবে ভারত এবং বাংলাদেশ— দুই দেশেরই সাম্প্রদায়িক শক্তি একে অপরের পরিপূরক এবং একে অপরকে শক্তিশালী করছে। যখন চরম দারিদ্র, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, ছাঁটাই ইত্যাদি পুঁজিবাদসৃষ্ট সংকটে জনজীবন চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত এবং এই সবের বিরুদ্ধে সকল সম্প্রদায়ের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম একান্ত প্রয়োজন, তখন সাম্প্রদায়িকতা সেই ঐক্যকেই বিনষ্ট করছে। দুই দেশের ক্ষেত্রেই কথাটি সত্য। দুই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই আজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফল হিসাবে অসংখ্য সংকটে জর্জরিত। রুটি-রুজি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য বা গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে যখনই তাঁরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন, সেখানে ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের ভেদাভেদ থাকে না। কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিকী শোষণ কোনও মানুষকেই রেয়াত করে না, সে তিনি যে ধর্মেরই হোন না কেন। বাংলাদেশের জনসাধারণের ক্ষেত্রেও এ জিনিস বারে বারে দেখা গিয়েছে— মুক্তিযুদ্ধ, এরশাদ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনেও। ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের এই ঐক্য বাংলাদেশে যথেষ্ট সক্রিয়। এই শক্তি অতীতের মতোই এ বারও বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে নিশ্চয় পরাস্ত করতে সক্ষম হবে।

সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণই হোক কিংবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই হোক, তা কখনওই কোনও ধর্মের সাধারণ মানুষ সংগঠিত করে না। এর মূল কারণ রাজনৈতিক। অর্থাৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকেই কিছু ধুরন্ধর রাজনৈতিক শক্তি এমন আক্রমণ বা দাঙ্গায় মদত দিতে থাকে। যতই সম্প্রদায়গত স্বার্থের কথা বলুক, কোনও দেশের কোনও সাম্প্রদায়িক সংগঠনই সেই সম্প্রদায়ের যথার্থ বন্ধু হতে পারে না। সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা বলে বাস্তবে তারা শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থকে চরিতার্থ করে এবং শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই থেকে বিরত রাখে। তাই বিজেপি এবং তার সহযোগী শক্তিগুলি যখন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নামে চোখের জল ফেলে তখন তাকে কুমীরের চোখের জল ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়। এরা বাংলাদেশ নিয়ে যে আবেগ দেখাচ্ছে তার ছিটেফোঁটাও নেই মণিপুর নিয়ে। ফলে ভণ্ডামি আজ নগ্ন। এদের মতলববাজ রাজনীতির ফাঁদে পা দিয়ে অপপ্রচারের স্রোতে ভেসে গেলে চলবে না। এটা আনন্দের বিষয় যে, বাংলাদেশের মুসলিম-হিন্দু নির্বিশেষে শুভবুদ্ধির মানুষেরা এই দুষ্ট রাজনীতির প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রে জাগ্রতি মোলকারিন সংঘর্ষ সমিতি গঠিত

● *বাংলায় যাঁদের পরিচারিকা বলা হয় মহারাষ্ট্রে তাঁরা মোলকারিন নামে পরিচিত। ৩০ নভেম্বর নাগপুরে ৭০ জন মোলকারিন শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র উদ্যোগে সংগঠিত হয়ে গড়ে তুললেন 'জাগ্রতি মোলকারিন সংঘর্ষ সমিতি'। সভাপতি বিদ্যা গুরনুলে এবং সম্পাদক পদ্মা দাস জানান, চার দফা দাবিতে তাঁদের আন্দোলন। উপদেষ্টা বিজেন্দ্র রাজপুত এবং সুব্রহ্মণ্যম জানান, মাসে চার দিন ছুটি, শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, ৬০ বছর বয়সের পর পেনশন এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাগুলি সুনিশ্চিত করার দাবিতে তাঁদের আন্দোলন*

✦ মাটিয়ারিতে এআইডিওয়াইও-র সম্মেলন

অভয়ার ন্যায়বিচার ও সকল বেকারের কাজের দাবিতে এবং সাম্প্রদায়িকতা-অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে ৩ ডিসেম্বর নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার মাটিয়ারিতে এআইডিওয়াইও-র লোকাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আশীর্বাদ লজে। আলোচক ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মসিকুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন জেলা ইনচার্জ সেলিম মল্লিক, আনারুল হক প্রমুখ।

কমরেড জহিরউদ্দিন বিশ্বাসকে সভাপতি, কমরেড সাকিল আলি সেখকে সম্পাদক ও কমরেড মহসিন সেখকে কোষাধ্যক্ষ করে ২২ জনের যুব কমিটি গঠিত হয়।

বারাসাতে কৃষক বিক্ষোভ

● *ফসলের ক্ষতিপূরণ, কৃষিঋণ মকুব, বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান, সারের কালোবাজারি বন্ধ, স্মার্ট মিটার বাতিল, গ্রামীণ মজুরদের ২০০ দিনের কাজ ও ৬০০ টাকা মজুরি এবং আবাস যোজনায় দুর্নীতি বন্ধের দাবিতে ১৮ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাত জেলাশাসক দফতরে কৃষকদের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন।*

ভারত কেন ইজরায়েলকে গণহত্যার অস্ত্র জোগাবে?

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া গাজায় যে শিশুটির ছিন্নভিন্ন দেহের ছবি আপনাকে কাঁদিয়েছে, তারই রক্তের ছিটে যদি আবিষ্কার করেন ভারতীয় অস্ত্র কোম্পানির মুনাফার হিসাব লেখার খাতায়! ভারতীয় হিসাবে আপনি, আমি সকলে কোন গৌরবের অধিকারী হব! প্রশ্নটা উঠছে কারণ, গাজায় ইতিমধ্যেই ৫০ হাজার মানুষের সরাসরি যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে। অনাহার, পানীয় জলের অভাব চিকিৎসার অভাবে দুই লক্ষের বেশি মানুষ জীবন হারিয়েছেন। দুঃখের হলেও সত্য যে, এই গণহত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্রের একটি বড় অংশ সরবরাহ করা হচ্ছে ভারত থেকে। গণহত্যার অভিযোগ জানা সত্ত্বেও ইজরায়েলকে অস্ত্র বেচছে ভারতের কিছু অস্ত্র সরবরাহকারী কোম্পানি। যার মধ্যে আছে রাষ্ট্রায়ত্ত মিউনিশনস ইন্ডিয়া লিমিটেড, বেসরকারি মালিকানাধীন প্রিমিয়ার এক্সপ্লোসিভস, আদানি ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যারোস্পেস লিমিটেড প্রভৃতি।

প্রখ্যাত আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ এবং চেরিল ডিসুজার মতো আইনজীবী ও আইনের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, জেনেভা ইন্টারন্যাশনাল জেনোসাইড কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী কোনও রাষ্ট্র গণহত্যা চালাচ্ছে বা চালাতে পারে এ রকম সম্ভাবনা দেখলেই যে কোনও দেশের কর্তব্য তার সাথে সমস্ত অস্ত্র ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া। কোনও দেশ গণহত্যার খবর জেনেও অপরাধী দেশকে অস্ত্র সরবরাহ করলে তাকেও ওই দুষ্কর্মের শরিক হিসাবে গণ্য করা হয়। ভারত সরকারের অজানা নয় যে, আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালত (ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস বা আইসিজে) গত জানুয়ারি মাসেই ফুল কোর্ট শুনানিতে ইজরায়েলকে প্যালেস্টাইনে গণহত্যা চালানোর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছে। এই আদালত প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের উপস্থিতিকেও বেআইনি বলেছে। আন্তর্জাতিক আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল, ইজরায়েলের এই বেআইনি দখলদারিতে সাহায্য হয় এমন কোনও কাজ কোনও রাষ্ট্র করতে পারবে না। আন্তর্জাতিক আদালত ওই রায়েই বলেছিল, জেনোসাইড কনভেনশনের আর্টিকেল-৩ অনুসারে কোনও রাষ্ট্র অস্ত্র রপ্তানির মাধ্যমে গণহত্যার শরিক বনে গেলে তার অপরাধও গণহত্যাকারীদের মতোই শাস্তিযোগ্য। এই কনভেনশনের আর্টিকেল-১ অনুযায়ী সমস্ত রাষ্ট্র এই নিয়ম মেনে চলতে দায়বদ্ধ (১৭.০৯.২৪ দ্য হিন্দু)।

আইনজীবীদের মতে, এই কারণেই ইজরায়েলে অস্ত্র রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা ভারত সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। গত সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে ভারতের বেশ কিছু অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্তা, শিক্ষাবিদ ও আইনবিদের দায়ের করা একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সরকার বলেছিল, এখন অস্ত্র রপ্তানির লাইসেন্স বাতিল করলে কোম্পানিগুলিকে চুক্তি খেলাপের দায়ে পড়তে হবে। এ ছাড়া, সরকারের বিদেশনীতির বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই যুক্তিতেই সিলমোহর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিদেশনীতি এবং চুক্তিভঙ্গের ফলে ভারতীয় পুঁজিপতিদের ক্ষতির প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি বাতিল করে দিলেও আইনজীবীদের মতে, বিদেশনীতি সর্বদাই আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও আইন এবং নৈতিকতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার কথা। যে কোনও দেশের বিদেশ সংক্রান্ত আইন ও আচরণ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে তা পরিবর্তন করাটাই কর্তব্য। এ ছাড়া, চুক্তিভঙ্গ হওয়ার যে আশঙ্কা সরকার তুলেছে আইনজীবীরা তাও নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন, যে কোনও অস্ত্রচুক্তির অবশ্যপালনীয় শর্ত থাকে— কোনও ভাবে এই অস্ত্র গণহত্যা, শিশুহত্যা বা অন্য কোনওভাবে অন্যায় যুদ্ধে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা দেখামাত্রই অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করা ও রপ্তানিকারক কোম্পানির লাইসেন্স সাসপেন্ড করা সে দেশের সরকারের কর্তব্য। এই কাজটি না করেই বরং ভারত সরকার আন্তর্জাতিক আইন ভাঙছে।

প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও আইসিজে আদালত জার্মানি বনাম নিকারাগুয়া মামলায় জার্মান সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে ইজরায়েলে অস্ত্র পাঠানো সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। হেগের অ্যাপিল আদালত নেদারল্যান্ড সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে ইজরায়েলে এফ-৩৫ বিমান রপ্তানির চুক্তি বাতিল করতে হবে। আইসিজে আদালতের রায় মেনে এই দুটি দেশ সহ কানাডা, স্পেন, এমনকি ব্রিটেনও ইজরায়েলে অস্ত্র রপ্তানিকারী কোম্পানিগুলির লাইসেন্স সাসপেন্ড করেছে। দুঃখের বিষয়, যে দুটি শক্তি এই গণহত্যার প্রতি চোখ বুজে থেকে অস্ত্র দিয়ে ইজরায়েলকে সাহায্য করে চলেছে তার একটি বিশ্বমানবতার অন্যতম শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, এবং অপরটি এমন এক দেশ, যার জনগণ বহু বছরব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঐতিহ্য বহন করে এসেছেন— সেই ভারত। ভারতীয় শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়ে যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা নিচ্ছে এটা তারই পরিণাম। এ দেশের সত্যিকারের গৌরব রক্ষা করতে হলে জনগণকে তাই শাসক শ্রেণির এই জঘন্য ভূমিকার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে।

সম্প্রতি জানা গেছে, ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধেও ভারতীয় কোম্পানির তৈরি কামানের গোলা ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য রাশিয়াকে যুদ্ধ সরঞ্জাম বেচার দায়ে ১৯টি ভারতীয় কোম্পানিকে চিহ্নিত করেছে মার্কিন সরকার। অর্থাৎ যুদ্ধে দুই পক্ষকেই অস্ত্র দিচ্ছে ভারত! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মুখে যতই শান্তির কথা বলুন, ইউক্রেনের যুদ্ধে এবং ইজরায়েলের যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার সরকারের মদতে অস্ত্র যে যাচ্ছে তা চাপা দেওয়ার কোনও উপায় নেই। এ ছাড়াও ভারত থেকে ইজরায়েলে শত শত শ্রমিক পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে ভারত সরকার, যাদের অনেককেই যুদ্ধ পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজে লাগানো হচ্ছে। রাশিয়ার হয়েও ভারতীয় বেকার যুবকরা যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বাধ্য হচ্ছে। একই সাথে দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একবার ইজরায়েলের সঙ্গে বৈঠক করলে কিছুক্ষণ পরেই তিনি ও তাঁর সরকারের আমলারা প্যালেস্টাইনের সাথেও বৈঠক করেন। তার পরেই তিনি ছোটেন আমেরিকায়, যাতে অস্ত্র বেচায় কোনও সমস্যা না হয়। এদিকে তিনি একবার রাশিয়া ছুটলে তার কিছুদিন বাদেই ছোটেন ইউক্রেনে। সেখানে তিনি ভাসা ভাসা ভাবে 'শান্তি চাই', 'সময়টা যুদ্ধের নয়', ইত্যাদি নানা অর্থহীন কথা বললেও এখনই যুদ্ধ থামান, এই কথা বলবার ক্ষমতা তাঁর হয় না কেন?

আসলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি যেমন এই সমস্ত যুদ্ধ থেকে ফয়দা তুলছে, একই ভাবে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিমালিকরাও আজ যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবসাকেই তাদের মুনাফা অর্জনের পাখির চোখ করেছে। নরেন্দ্র মোদি এই মালিকদের এজেন্সি নিয়ে দেশে দেশে অস্ত্র বেচার দূতের ভূমিকায় লিপ্ত। তাই 'যুদ্ধ থামাও' এই শব্দ ভারতের কর্তারা উচ্চারণ করছেন না। বরং ভারত সরকার যুদ্ধ থেকে সুযোগ তুলছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সুযোগে সস্তায় রাশিয়া থেকে পেট্রলিয়াম কিনছে তারা এবং তা থেকে দেশের পুঁজিপতিরা বিপুল মুনাফা করছে। সম্প্রতি একটি রিপোর্ট দেখিয়েছে রাশিয়ার এই তেল সস্তায় কিনে ভারতীয় কোম্পানিগুলি তা শোধনের পর ইউরোপেই বেচেছে। ফলে তারা আরব দুনিয়ার থেকেও রপ্তানিতে বেশি লাভ তুলেছে। দেখা গেল এ দেশের সুপ্রিম কোর্টও অস্ত্রব্যবসা সংক্রান্ত মামলায় ভারতীয় মালিকদের এই সুযোগ-সন্ধানের বিষয়টিকে বেশ গর্বের বিষয় হিসাবে বলেছে। ফলে যুদ্ধ থামলে যেমন মার্কিন পুঁজির ক্ষতি, ভারতীয় ধনকুবেরদেরও ক্ষতি।

ভারত একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রের কাজ পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করা। রাষ্ট্রের আসল মালিক পুঁজিপতি শ্রেণি যে চাইছে না যুদ্ধ বন্ধ হোক— এই রাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গ বিচারব্যবস্থার আচরণই তার বড় প্রমাণ। না হলে মানুষের প্রাণঘাতী যুদ্ধ থেকে সুযোগ নেওয়ার মতো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার লজ্জাজনক উদাহরণ ন্যায়ালয়ের মুখে আসত কি? অবশ্য, যুদ্ধের সুযোগে, মানুষের জীবনের বিনিময়ে পাওয়া মুনাফার সুযোগকে সমর্থনের রায় দিতেও 'ঈশ্বরের নির্দেশ' সদ্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পেয়েছিলেন কি না, তিনিই বলতে পারবেন।

ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের স্বার্থে অস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবসার প্রয়োজনে সামরিক কৌশলগত সুবিধার জন্য ভারত সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সাথে হাত মিলিয়ে ভারত থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইজরায়েল ছুঁয়ে ইউরোপ পর্যন্ত বাণিজ্য করিডোর বানাতে আগ্রহী। একই ধরনের সামরিক ও বাণিজ্যিক কৌশলগত স্বার্থে মার্কিন কর্তারা ইজরায়েলকে কাজে লাগিয়ে সিরিয়া, লেবানন সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ স্থানে থাবা বসাতে চাইছে। এই বিষচক্রের নজরে পড়ে ওই অঞ্চলের মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা মদত দিয়ে আইসিসের মতো চরম মানবতাবিরোধী মৌলবাদী-সন্ত্রাসবাদীদের সৃষ্টি করেছিল। আবার তারাই প্যালেস্টাইন, লেবানন, ইয়েমেনে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করা সংগঠনগুলিকে সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়ে ইজরায়েলের বকলমে মানব ইতিহাসের অন্যতম ঘৃণ্য আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সিরিয়ায় আলকায়দা ও অইসিসের বকলামে চলা বিদ্রোহী বাহিনীকে মার্কিন কর্তারাই মদত দিচ্ছেন।

ভারতীয় শীর্ষ আদালত যে অস্ত্র কোম্পানিগুলির মুনাফার স্বার্থে গণহত্যার প্রতি চোখ বুজে থাকাকেই কার্যত সমর্থন করল, তাতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের তুলে ধরা একটি সত্য আবার প্রমাণিত হল— কোনও রাষ্ট্রের বিচারালয় সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণিরই প্রতিনিধিত্ব করে, মূলত তাদেরই স্বার্থ রক্ষা করে। তাই চুক্তিভঙ্গে কোম্পানি মালিকের ক্ষতি নিয়ে বিচারবিভাগ চিন্তিত, মালিকের মুনাফার টাকায় গাজার মৃত শিশুটির রক্ত লেগে থাকলে 'ন্যায় বিচারের তুলাদণ্ড' হেলে না! ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে 'জনগণের বিচারপতি' বলে পরিচিত, ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার বলেছিলেন, 'বিচারব্যবস্থা তার শ্রেণিচরিত্রের জন্যই আইনের যে ব্যাখ্যা উপস্থিত করে তা সার্বিক অর্থে ধনবান শ্রেণিকেই সাহায্য করে, সম্পত্তিহীনদের নয়। সামাজিক স্তরবিন্যাস, প্রশাসকদের শাসনদণ্ড, আইনসভা এবং বিচারব্যবস্থা প্রত্যেকেরই রাজনৈতিক চরিত্র আছে।' (পভার্টি অ্যান্ড পলিটি অফ জুডিসিয়ারি ঃ কৃষ্ণআইয়ার, দ্য হিন্দু ২৯.১২.২০১৩, এবং দ্য হিন্দু ৪.১২.২০২১) এই সত্যটাই আজ আবার মনে পড়াচ্ছে সরকার এবং সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা।

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের ডেপুটেশন

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন বাঁকুড়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ওষুধ, কিট সহ সরঞ্জাম কেনার অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে ৬ ডিসেম্বর বাঁকুড়া জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা লক্ষ্মী সরকারের নেতৃত্বে ১০ জনের একটি প্রতিনিধি দল জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের সাথে দেখা করেন।

দাবি জানানো হয় যে ওষুধ ও কিট কেনার ক্ষেত্রে যা অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে তদন্ত সাপেক্ষে তা প্রকাশ্যে আনা, দোষীদের শাস্তি দেওয়া এবং ওষুধের গুণমান সহ হাসপাতাল পরিষেবার উন্নতির কাজগুলি করতে হবে। সিএমওএইচ দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। তিনি দাবিগুলি সাধ্যমতো পূরণের চেষ্টা করবেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনবেন বলে জানান।

শুনলেই ভয় বিজেপির

একের পাতার পর

কারও মনগড়া অর্থ এর ওপর চাপানো চলে না। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ, রাষ্ট্র ধর্মীয় বিশ্বাস বা আচরণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকবে। রাষ্ট্র কোনও ধর্মাচরণে যেমন বাধা দেবে না, তাতে উৎসাহও দেবে না। ধর্ম ব্যক্তির বিশ্বাসের বিষয় হিসাবে থাকবে। অথচ এ দেশে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই সরকারি অনুষ্ঠানে হিন্দু ধর্মীয় অনুষঙ্গ যেন খুব সাধারণ ঘটনা। বিজেপি শাসনে তা যেন নতুন মাত্রা পেয়েছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির আস্ফালনে দেশে সংখ্যালঘু অংশের মানুষ বিপন্নতার মুখে পড়ছেন প্রায়ই। অথচ সে সব ঘটনার নিন্দা করা ও তা প্রতিরোধ করার কোনও উদ্যোগ না কেন্দ্রের, না বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি সরকারের কর্তাদের মধ্যে চোখে পড়ে না। এমনকি গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে পরিচিত সংসদের নতুন ভবন উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হিন্দু মন্দিরের একদল পূজারীকে সাথে নিয়ে যে আচরণ করেছেন, তা ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে চরমভাবে লঙ্ঘন করে। সুপ্রিম কোর্টের সদ্যপ্রাক্তন বিচারপতিকেও দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রীকে সাথে নিয়ে গণেশ আরতিতে মাততে এবং তা প্রচার করতে। দেখা যাচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের মতো প্রতিষ্ঠানও 'ভারতীয়করণের' নাম করে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে লঘু করে দিচ্ছে। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ থাকা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম শর্ত। শাসক দলগুলোর নেতা-মন্ত্রীদের লাইনেই সুপ্রিম কোর্ট ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যা দাঁড় করাতে চেয়েছে তাকে অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক না বলে উপায় নেই।

সমাজতন্ত্র শব্দটিরও নতুন অর্থ করতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত বলেছে, ভারতের সংবিধানে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ কোনও বিশেষ আর্থিক দর্শন বোঝাচ্ছে না। ভারতের সংবিধানে এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে আর্থিক সাম্যের ইচ্ছা থেকে। বেসরকারি পুঁজির যথেচ্ছ কারবারের কোনও বাধা এর মধ্যে নেই। এই ব্যাখ্যাটিও পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিহাসিক। সমাজতন্ত্রের ধারণা সমাজের অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট স্তরে উদ্ভূত হয়েছে। পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা এসেছে। যার ভিত্তি হল সমস্ত সম্পদের ওপর ব্যক্তিমালিকানাকে উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা। এটাই হল মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ থেকে সমাজের মুক্তির একমাত্র রাস্তা। সমাজতন্ত্রের নাম করে অন্য কোনও কিছুই নিছক ভণ্ডামি।

অবশ্য ভাবা দরকার, ইন্দিরা গান্ধীর মতো একজন স্বৈরাচারী শাসক জরুরি অবস্থার মধ্যে কেন এই দুটি শব্দ সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঢোকাতে গেলেন? কংগ্রেস দল ইন্দিরা গান্ধীকে 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য' বলে যতই শোরগোল তুলুক না কেন, সেই সময় তাঁর দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণের ক্ষোভ ফেটে পড়ছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে গোটা উত্তরভারতে ঢেউ উঠেছিল। লোকসভায় ইন্দিরাজির নির্বাচনও এলাহাবাদ হাইকোর্ট কারচুপির দায়ে খারিজ করে দেয়। এই পরিস্থিতি সামলাতে ইন্দিরাজি ১৯৭৫-এর ২৫ জুন জরুরি অবস্থা জারি করেন। ১৯৭৬-এ জরুরি অবস্থার মধ্যে তিনি ৪২তম সংবিধান সংশোধনী পাশ করিয়ে নেন। এর মধ্য দিয়ে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের স্বার্থে রাষ্ট্রকে আরও বেশি স্বৈরাচারী করে তোলার ব্যবস্থা হয়। এই পরিস্থিতিতে তাঁর ক্ষয়ে যাওয়া ভাবমূর্তিকে একটু মেরামতের আশায় প্রগতিশীলতার মুখোশ পরে তিনি এই শব্দ দুটি প্রস্তাবনায় যোগ করেন। মনে রাখা ভাল, ইন্দিরা গান্ধী যখন ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি যোগ করছেন, ঠিক সেই সময় তিনি হিন্দু-মৌলবাদী সংগঠন আরএসএস-এর সাহায্যে দেশে হিন্দুত্বের হাওয়া তুলতে সচেষ্ট। জরুরি অবস্থার মধ্যে তিনি বলেছিলেন, আগে কংগ্রেস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখেছে, এখন থেকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখবে। বিজেপি নেতারা কি জানেন না যে, ইন্দিরাজির জরুরি অবস্থার অন্যতম সমর্থক ছিল আরএসএস?

এ বার আসা যাক সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে। শোষণ অত্যাচারে জর্জরিত পুঁজিবাদী দেশগুলির জনগণের কাছে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণ যে অমোঘ, তা কোনও পুঁজিবাদী শাসকই অস্বীকার করতে পারেন না। ভারতের স্বাধীনতার সময় থেকেই এমনকি সংবিধান তৈরির জন্য আহূত সভাতেও কয়েক বার 'সমাজতান্ত্রিক', শব্দটি রাখার প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু কংগ্রেস সহ অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দলের নেতাদের বাধায় তা গৃহীত হয়নি। তখন বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরাট বিস্তার সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসকদের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আকর্ষণ দেখে এ দেশের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি বাধ্য হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মতো কিছু কিছু কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ভারি শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থেই জহরলাল নেহেরু শুরু করেছিলেন। তিনি কিছু কিছু 'সমাজতান্ত্রিক' কথাবার্তাও বলতেন, কিন্তু তাতে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক ভাবনার রেশমাত্র ছিল না।

পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধী পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থেই ব্যাঙ্ক, খনি, রেলপথ ইত্যাদি জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেন। এখানে জনস্বার্থের থেকেও বড় ছিল পুঁজিবাদকে সংহত করার পরিকল্পনা। কিন্তু এ দেশের সিপিআই-সিপিএমের মতো বামপন্থীরা এটাকেই বিশাল 'প্রগতিশীলতা' বলে তুলে ধরতে থাকে। ইন্দিরা গান্ধীকে প্রায় সমাজতান্ত্রিক নেতা বানিয়ে দেন তাঁরা। বাস্তবে এই সমস্ত পদক্ষেপ ছিল জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে বৃহৎ শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে দেওয়ার উদ্যোগ। আজ যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিকাঠামোকে বৃহৎ পুঁজি মালিকদের হাতে রাষ্ট্রের কর্ণধাররা তুলে দিচ্ছেন, এটা ছিল তারই প্রস্তুতি। ইন্দিরাজি তথাকথিত বৃহৎ বামপন্থী দলগুলির বিভ্রান্তির সুযোগ নিতে ছাড়েননি। তিনিও খেটে খাওয়া মানুষকে ধোঁকা দিতে 'সমাজতান্ত্রিক' সাজার চেষ্টা করেন। আজ সমাজতান্ত্রিক শিবির অনুপস্থিত। কিন্তু তার মধ্যে যে উন্নত জীবনের স্বাদ দুনিয়ার মানুষ পেয়েছিল, সে স্মৃতি জনমানসে আজও অমলিন। তাই দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ সুপ্রিম কোর্টও সমাজতান্ত্রিক শব্দটিকে ঝেড়ে ফেলার ঝুঁকি নেয়নি। সংবিধানের প্রস্তাবনার অলঙ্কার মাত্র হয়ে শব্দটি থাকলে শাসক শ্রেণির কোনও অসুবিধা নেই। কারণ, সংবিধানে যত সমানাধিকারের কথাই লেখা থাক, তাতে এ দেশের মানুষের ওপর শোষণের স্টিমরোলার চালাতে মালিক শ্রেণির কোনও অসুবিধা হয় না। দেশে আর্থিক বৈষম্য বাড়ার গতিও এতটুকু কমে না। শাসক শ্রেণি জানে, শোষিত মানুষের সমাজতন্ত্রের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ সত্ত্বেও মেকি বামপন্থী দলগুলির কল্যাণে শ্রমজীবী মানুষের বিরাট অংশের মধ্যে মার্ক্সবাদ সংক্রান্ত ধারণা স্বচ্ছ হতে পারেনি। তারা এর সুযোগে সমাজতন্ত্র শব্দটিকে খেটে খাওয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজে লাগাতে পারে। তাই সুপ্রিম কোর্টও বিশেষ বাচনভঙ্গিতে বুর্জোয়া শ্রেণিকে অভয় দিয়েছে— সমাজতন্ত্র শব্দটা লেখা থাক, তাতে তোমাদের লুঠে কোনও বাধা আসবে না।

এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে প্রভাবশালী আপসমুখী ধারাটির গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতৃত্ব নিজেরাই তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুত্বের মনোভাবে আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁরা সামন্ততন্ত্র ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উভয়ের সঙ্গেই আপস করে এ দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর চেয়েছিলেন। বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, এই নেতৃত্বের আপসের কারণেই স্বাধীনতা আন্দোলনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজটা অপূর্ণ থেকে গেছে। তাঁদের জাতীয়তাবাদ ছিল ধর্মীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন অর্থাৎ রিলিজিয়ন ওরিয়েন্টেড ন্যাশনালিজম। যা হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ হিসাবে একদিকে যেমন আরএসএসের মতো গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী সংগঠনকে জমি পেতে সাহায্য করেছে, তেমনই মুসলমান সহ অহিন্দু জনগোষ্ঠী এমনকি তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষকেও স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে কিছুটা দূরে ঠেলেছে। ফলে মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তিও মাথা তোলার রাস্তা পেয়েছে। যদিও দেশের সাধারণ মানুষের উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, আপসহীন ধারার প্রতিনিধি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও ভগৎ সিংয়ের মতো ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং সর্বোপরি দুনিয়া জুড়ে সেই সময় সমাজতন্ত্রের মহান আদর্শের প্রভাবে স্বাধীন ভারতের শাসকরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেননি। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃত্বের দুর্বল অবস্থানের কারণে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সুস্পষ্ট করে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি যুক্ত হয়নি। কিন্তু দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ চেতনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে না পেরে এবং সদ্য স্বাধীন দেশে পুঁজিবাদের সামগ্রিক প্রয়োজনে সংবিধানে তারা 'বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতার' কথা লিখেছিল।

তা হলে এই শব্দদুটি যোগ হওয়ার ৪৪ বছর পর বিজেপি নেতারা তা মুছে ফেলার কথা বলছেন কেন? ভোটের স্বার্থে কখনও নরেন্দ্র মোদি সাহেবকে 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ' বলতে হয়। কখনও এর সাথে যোগ করতে হয় 'সব কা বিশ্বাস'। কিন্তু উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতা ও তথাকথিত নিম্নবর্ণের প্রতি বিদ্বেষই তাঁদের ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির মূল হাতিয়ার। সেই হাতিয়ারে শান দিতে এবং প্রচারে আসার তাগিদেই ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির প্রতি তাঁদের এই বিষোদগার। আর সমাজতন্ত্র! বিজেপি সরকার আজ মুষ্টিমেয় একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর তাঁবেদার হিসাবে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত। তাদের রাজত্বে আর্থিক বৈষম্য চরম আকার নিয়েছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারকে তারা দু-পায়ে মাড়িয়ে চলেছে।

এই সময় নামেমাত্র 'সমাজতন্ত্র' শব্দটিও তাদের গায়ে জ্বালা ধরায়। এককেন্দ্রিক ফ্যাসিবাদী স্বৈরশাসন কায়েমে সমাজতন্ত্র শব্দটি যে বড়ই পীড়াদায়ক! তাই তা ছেঁটে ফেলতে সুপ্রিম কোর্টে ছুটেছিলেন তাঁরা!

বিজেপির এই নেতাদের ধন্যবাদ। তাঁরা দলের সাম্প্রদায়িক এবং একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী চরিত্রটিকেই এর দ্বারা আবারও স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

বন্যা-দুর্গতদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ

'পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন'-এর উদ্যোগে ও 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি'র সহযোগিতায় ২৪ নভেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘাটালের এলোচক ও তার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের ১২০টি বন্যাদুর্গত অসহায় পরিবারকে শীতের কম্বল ও কিছু খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুনির্মল দাসের নেতৃত্বে ৫ জনের একটি দল।

উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবাশীষ মাইতি ও কমিটির অন্য সদস্যরা।

ফুলচাষিদের ক্ষতিপূরণ দাবি

চলতি বছরে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় ফুল চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবিলম্বে ফুলচাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়ে ৩ ডিসেম্বর সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী ও সচিবের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক।

ভ্রম সংশোধন ঃ গত সংখ্যায় প্রকাশিত দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় সম্মেলনের সংবাদে কিছু ভুল থেকে গিয়েছিল। সঠিক সংবাদ হবে— প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান অতিথি অধ্যাপক চমনলাল, বিশেষ অতিথি কমরেড অরুণ সিং এবং সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড ভি এন রাজশেখর বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। সেশন ফর লেফট ইউনিটিতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড অজিত পাওয়ার। অ্যাকাডেমিক সেশন পরিচালনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আলিনা। এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

মোদি শাসনে সাড়ে দশ কোটি জব কার্ড বাতিল

গ্রামের শ্রমিকদের একটা গুরুত্বপূর্ণ দাবি— মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্টে বছরে ২০০ দিন কাজ দিতে হবে। এই অ্যাক্টে বর্তমানে ১০০ দিন কাজ দেওয়া বাধ্যতামূলক, যদিও কোনও রাজ্যে কোনও সরকারই বছরে ১০০ দিন কাজ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি। বছরে ২০, ৩০, ৪০, ৫০ দিন পর্যন্ত কাজ দিয়েছে। তা নিয়েও রয়েছে নানা দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগ। এই স্কিমটিকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য বিজেপির নানা ভূমিকা রয়েছে। মোদি সরকার কখনও এই স্কিমে বরাদ্দ কমিয়েছে, আবার কখনও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে চাপে ফেলার জন্য এই স্কিমের টাকা আটকে দিয়েছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালের ২৬ ডিসেম্বর থেকে এই প্রকল্পে কোনও টাকাই দেয়নি। সম্প্রতি খবরে প্রকাশ, সারা ভারতে এই প্রকল্পে মোট ১০ কোটি ৪৩ লক্ষ জব কার্ড বাতিল করা হয়েছে।

জব কার্ড গ্রামীণ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কোনও কারণে এই কার্ড বাতিল করা হলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক হারাবে কাজ পাওয়ার আইনি গ্যারান্টি, যা তার বেঁচে থাকার সামনে প্রতিবন্ধক হিসাবে আসবে। স্বাভাবিকভাবেই কার্ডগুলি বাতিল করার আগে সরকারের পক্ষ থেকে কানুনি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা জরুরি ছিল সেগুলি বাতিলযোগ্য কিনা, অথবা কী প্রক্রিয়ায় তা বৈধ করা যায় তা বিচার বিবেচনা করা। প্রায় সাড়ে ১০ কোটি কার্ড বাতিল তো আর সামান্য বিষয় নয়! এতগুলি লোকের রোজগার বিপন্ন হওয়ার সময় যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ঠিকঠাক নথিপত্র যাচাই করা হয়েছিল কি?

কী কী কারণে জব কার্ড বাতিল হতে পারে? এ বিষয়ে ২০২১-২২ সালের সার্কুলারে বলা হয়েছে, ১) যদি কোনও পরিবার স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে যায়, ২) যদি জব কার্ডটি ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়, ৩) যদি প্রমাণিত হয়, যে জব কার্ড দেওয়া হয়েছে তা ভুলভাল নথির ভিত্তিতে দেওয়া, তাহলে তা বাতিলযোগ্য। এ ছাড়া প্রকল্পটির ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম নাম বাতিল এবং কার্ড বাতিলের আরও কিছু মাপকাঠি ঠিক করেছে, যেমন ডুপ্লিকেট আবেদনকারী, ভুয়ো আবেদনকারী এবং কাজ করতে না চাওয়া ইত্যাদি।

লোকসভায় কার্ড বাতিল নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ লিখিতভাবে জানান, নাম সংযোজন এবং বিয়োজন একটি রুটিন ওয়ার্ক, যা নিয়মিত করা হয়ে থাকে প্রকল্পটির স্বচ্ছতা এবং যথাযথ পরিচালনার জন্য। প্রশ্ন হল, নাম সংযোজন দারিদ্র্যের কারণে জরুরি হলেও গণহারে নাম বাতিল কী উদ্দেশ্যে?

প্রকল্পটির তথ্য ঘাঁটলে দেখা যায়, ২০২১-২২ সালে জব কার্ড বাতিলের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪৯ লক্ষ। ২০২২-২৩ সালে সংখ্যাটা ২৪৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ। গত চার বছরে বাতিলের মোট সংখ্যাটা দাঁড়ায় ১০ কোটি ৪৩ লক্ষ। লক্ষণীয় বিষয় হল ২০২২-২৩ সালেই আধার কার্ড ভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম বাধ্যতামূলক করা হয়। আর ওই সময়ই কার্ড বাতিল ২৪৭ শতাংশ বেড়ে যায়। তাহলে এই দুইয়ের মধ্যে কি কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে?

ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখে যে, আধার লিঙ্ক করার সময় নথিপত্র যথাযথ সত্যতা বিচার না করে বহু কার্ড বাতিল করা হয়েছে। পত্রিকাটির সমীক্ষক দল সারা দেশে দশটি রাজ্যে খোঁজ নিয়ে দেখেছে, নাম বাতিলের ক্ষেত্রে গ্রামসভার বক্তব্য শোনা বাধ্যতামূলক হলেও বহু ক্ষেত্রে তা শোনা হয়নি। সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের বক্তব্যও শোনা হয়নি।

অনুসন্ধানের জন্য দেশের ২১টি রাজ্যের প্রত্যেকটিতে একটি করে ব্লক অপক্ষপাতমূলকভাবে বেছে নেওয়া হয়। ২১টি ব্লকের ১৯৯৪ টি গ্রামে জব কার্ড বাতিলের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দেখা যায় পাঁচটি রাজ্যে বেশি কার্ড বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে বিহারের ঔরঙ্গাবাদ জেলার মদনপুর ব্লকে বাতিল হয়েছে ৫৩ হাজার, ৩২ হাজারের মতো বাতিল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর-১ ব্লকে, অন্ধ্রপ্রদেশে একটি ব্লকে বাতিল হয়েছে ৩০ হাজার, ওড়িশায় একটি ব্লকে ২৬ হাজার, গুজরাটে একটি ব্লকে ২৩ হাজার। সমীক্ষক দল আরও দেখেছে, পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য রাজ্যে বাতিল ২ লাখ ৬৭ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৭১ শতাংশ অর্থাৎ ১,৮৯,৫৫৫ জন নাকি জানিয়েছে, তারা কাজ করতে চায় না।

শ্রমিকরা কাজ করতে চায় না এ কথা কি আদৌ যুক্তিসঙ্গত? গ্রামে ফসল বোনা এবং কাটার কয়েক মাস বাদ দিলে সারা বছর সুনির্দিষ্ট কোনও কাজ থাকে না। এই অবস্থায় এই প্রকল্পে নিশ্চিত কাজটুকু তারা করতে চাইবে না কেন? এ বিষয়ে আরটিআই করে জানতে চাওয়া হলে গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে বলা হয়, মন্ত্রক এ বিষয়ে সত্যতা যাচাই করে দেখেনি। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, সত্যতা যাচাই না করে এতগুলো শ্রমিকের কার্ড বাতিল করেছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইন অনুযায়ী এটা গুরুতর অপরাধ।

এসইউসিআই(সি) এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। ইচ্ছুক সমস্ত শ্রমিককে জব কার্ড প্রদান, বছরে ২০০ দিন কাজ এবং দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরির দাবিতে ইতিমধ্যে দলের পক্ষ থেকে জেলায় জেলায় প্রচার শুরু হয়েছে। আগামী ২১ জানুয়ারি কলকাতার মহামিছিলে হাজার হাজার মানুষের সাথে গ্রামীণ শ্রমিকরাও শামিল হবেন। আওয়াজ তুলবেন বিজেপি সরকারের এই জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে।

(তথ্যসূত্র ঃ দ্য হিন্দু, ২৮ নভেম্বর ২০২৪)

৬ ডিসেম্বর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবসে উগ্র ধর্মান্ধতা প্রতিরোধে পূর্ব মেদিনীপুরে দলের সভা।

খাল সংস্কারের কাজ শুরুর দাবি

শিলাবতী নদীর নিম্নাংশ সহ কংসাবতী নদী সংস্কারের কাজ শুরু, চন্দ্রেশ্বর খালকে শিলাবতীর সাথে সংযুক্তিকরণ, সমস্ত নদীবাঁধগুলি পাকাপোক্তভাবে নির্মাণ সহ বিভিন্ন দাবিতে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ২৬ নভেম্বর মেদিনীপুরের সেচ দপ্তরের সুপারিনটেন্ডিং ও এক্সিকিউটিভ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে ৯ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আধিকারিকরা প্রতিশ্রুতি দেন বর্ষার আগে শিলাবতীর নিম্নাংশের ২৩ কিমি, ওল্ড কাঁসাইয়ের ১০ কিমি, কাঁকি ও পলাসপাই নদী এবং শোলাটপা খাল সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

এ ছাড়াও অন্যান্য বাঁধ ও খাল সংস্কারের কাজ দ্রুত শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেন তাঁরা।

২১ জানুয়ারি মহামিছিলের প্রচার চলছে রাজ্য জুড়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলির মৈপীঠে চলছে তারই প্রচার। ৮ ডিসেম্বর।

আলোর অভাব মাত্র

তিনের পাতার পর

ভিলেনরা। সারদা মামলায় তৃণমূলের সব অভিযুক্তই তো জামিন পেয়েছে। মুকুলবাবুকে তো সিবিআই ভুলে গিয়েছিল! গুজরাট দাঙ্গায় মোদিজিও তো ছাড় পেয়েছেন। সেখানে কী বলবে?' এটা শুনে রেগে গেলেন কার্তিকদা। কিন্তু রাগ চাপার চেষ্টা করে বললেন, 'ছাব্বিশটা আসতে দিন, তার পর দেখবেন।' বিমলদা আবার রুমাল দিয়ে নাক মুছে বললেন, 'চোদ্দ থেকেই তো দেখছি ভাই। গুজরাটে বেকার যুবকরা কাজের জন্য মারামারি করছে। বস্তি ঢাকতে পাঁচিল উঠছে। কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। দুর্নীতিও তো সীমাহীন। সিবিআই সুরাটের এবিজি শিপইয়ার্ডের বিরুদ্ধে প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগকে ভারতের 'বৃহত্তম ব্যাঙ্কিং কেলেঙ্কারি' বলেছে। তার মালিক গ্রেপ্তার হয়েছে? গুজরাটের নগরোন্নয়ন এবং রাজস্ব বিভাগ, পঞ্চায়েত এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের বিরুদ্ধে বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কোনও তদন্ত পদক্ষেপ সরকার করেছে? কয়েক বছর আগে গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল কলেজের ভর্তিতে জালিয়াতি হয়েছে, তদন্ত বা শাস্তি হয়েছে? গুজরাটের সরকারি কর্মকর্তা এবং দালালরা রীতিমতো কিস্তিতে ঘুষ নেয়, তা জান? মধ্যপ্রদেশের ব্যাপম কেলেঙ্কারির মতো ভয়ঙ্কর দুর্নীতি কটা হয়েছে ভারতে? প্রমাণ লোপাট করতে কতগুলো খুন পর্যন্ত হয়ে গেল। তারপর 'প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনা'য় কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কোনও বিরোধী নয়, অভিযোগ করেছে ক্যাগ (সিএজি)। ওখানে জৈব চাষের প্রচারের জন্য বরাদ্দ করা কোটি কোটি টাকা লোকাল অফিসারেরা লুটেছে। ইডি, সিবিআই কোথায় ভাই? আরেকটা হল উত্তরপ্রদেশ। সেখানে অবস্থা কী? মুসলিম, দলিতদের ওপর নির্যাতন ছেড়ে দাও। মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের জন্য সরকারি বৃত্তি প্রকল্পে ৭৫ কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারি হয়নি? শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়নি? দুর্নীতির জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্ট ৬৯ হাজার শিক্ষকের প্যানেল বাতিল করে দেয়নি? সব জেনে কেন বাজে বকো?'

কার্তিকদা নিস্তেজ স্বরে বললেন, 'আমি কোনও পার্টি করি না দাদা। মোদিজি একটা চেষ্টা করছেন, তাই ওনাকে ভালো লাগে।' বিমলদা বললেন, 'হ্যাঁ, চেষ্টা উনি আপ্রাণ করছেন। দেশের ঘটিবাটি যা আছে সব বেচে দেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই উনি করছেন। তাতে সন্দেহ নেই। দুনিয়ার যত বড় চোর ডাকাত তো এখন মোদিজির দলেই আশ্রয় নিয়েছে! এবার একটু মন দিয়ে তৃণমূলের ঘোড়া বেশি করে কিনে পশ্চিমবঙ্গে আসা যায় কি না দেখো।' রতন বলল, 'ওদের টাকা আছে। ওরা তা করতে পারে। তবে, এসব অন্যায়ের কোনও প্রতিকার নেই, এটা আমার মনে হয় না। পথটা খুঁজতে হবে। ওই যে অনুপদা আছে না, এস ইউ সি করে, উনি একটা কথা খুব ভালো বলেছিলেন যে, 'অন্ধকার হল আলোর অভাব। আলোটা বাড়াতে হবে, জোরদার করতে হবে। তাহলেই অন্ধকার শেষ হবে।' রতন বলে চলে— এখন কালো বেশি কিন্তু আলোও তো আছে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 18 Bengali Weekly December 13, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিলের প্রতিবাদে
১০ ডিসেম্বর বিক্ষোভ এআইডিএসও-র

রাজ্য বিধানসভায় সম্প্রতি তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল উত্থাপন প্রসঙ্গে এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ৮ ডিসেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের উচ্চশিক্ষার বেহাল অবস্থা লক্ষ করা যাচ্ছে। রাজ্যের ৩১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশগুলিতেই স্থায়ী উপাচার্য নেই। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ ফাঁকা রয়েছে।

শিক্ষকের অভাবে নিয়মিত পঠন-পাঠন হয় না। রাজ্যের রাজধানী খোদ কলকাতার বুকে ঐতিহ্যবাহী বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নেই, নেই পর্যাপ্ত অধ্যাপক। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও স্থায়ী ক্যাম্পাস নেই, অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। পরিকাঠামোহীন অবস্থায় মাত্র চারটি বিষয় নিয়ে মহিষাদল রাজ কলেজে চার-পাঁচ বছর ধরে চলছে মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন। মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও স্থায়ী ক্যাম্পাস নেই, পরিকাঠামোহীন অবস্থায় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ও ধুঁকছে। আলিপুরদুয়ার কলেজেই সাইনবোর্ড পাল্টে চালু করা হল আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়। কয়েকটি বিষয় নিয়ে নামমাত্র কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে নিয়ে চলছে একটা বিশ্ববিদ্যালয়। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়েও নেই স্থায়ী উপাচার্য, প্রয়োজনীয় শিক্ষক। একদিকে যখন ক্লাসরুমের স্বল্পতা, তখন তৈরি হওয়া বিল্ডিং পড়ে রয়েছে প্রশাসনিক জটিলতায়।

রাজ্যের বেশিরভাগ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চিত্র এমনই। উচ্চশিক্ষার এই ভয়াবহ দৈন্যদশা কাটাতে রাজ্য সরকারের উচিত ছিল রাজ্যের সমস্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা, সমস্ত শূন্যপদে স্থায়ী শিক্ষক, কর্মচারী এবং স্থায়ী উপাচার্য সহ প্রশাসনিক পদে স্থায়ী নিয়োগ করা এবং সামগ্রিকভাবে উচ্চশিক্ষার মানের উন্নয়ন ঘটানো। তা না করে আরও ৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা রাজ্য সরকার করছে যা উচ্চশিক্ষার বেসরকারিকণের রাস্তাকে আরও প্রসারিত করবে। রাজ্য সরকার মুখে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের শিক্ষানীতির বিরোধিতা করলেও আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতিকে অনুসরণ করেই শিক্ষায় কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সামগ্রিক বেসরকারিকরণের পথে হাঁটছে। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধিকার হরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার, যা চূড়ান্ত শিক্ষাস্বার্থবিরোধী।

তিনি বলেন, 'শিক্ষা কোনও পণ্য নয়, শিক্ষা অধিকার'। তাই সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচাতে, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সরকারি শিক্ষা ধ্বংসের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন গড়ে তুলছে এআইডিএসও। বেহাল উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের কোনও পরিকল্পনা না করে শিক্ষার বেসরকারিকরণকে ত্বরান্বিত করতে নতুন করে তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালুর প্রতিবাদে ১০ ডিসেম্বর এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ দেখাবে।

● **কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের প্রতিবাদ ঃ** দ্বাদশ শ্রেণির পর কলা বিভাগের অ্যাডমিশন টেস্টে পাশ করলে কলেজে বিজ্ঞান পড়তে পারবে— এমনই নিয়ম করতে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মজুরি কমিশন। এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এআইডিএসও। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবাশিস প্রহরাজ ৬ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, ইউজিসির কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বছরে দু'বার ভর্তির যে সিদ্ধান্ত তা মানা সম্ভব নয়। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষা বহুবার ছাড়া এবং ধরা আসলে ড্রপ-আউটকেই আইনসিদ্ধ করা। এতে সুসংহত শিক্ষা ব্যাহত হবে। তিনি এর বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে

অভয়ার বিচারহীনতার চার মাস পূর্তিতে ৯ ডিসেম্বর মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ডাকে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সাধারণ নাগরিকদের এক মোমবাতি মিছিল আর জি কর মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু হয়ে শ্যামবাজার পৌঁছায়। মিছিলে অনিকেত মাহাত, কিঞ্জল নন্দ, আসফাকউল্লা নাইয়া প্রমুখ জুনিয়র ডাক্তার এবং প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র, ডাঃ নীলরতন নাইয়া, ডাঃ সজল বিশ্বাস সহ মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের নেতৃবৃন্দ যোগ দেন।

দিল্লি ঃ অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির ধরনা

একের পাতার পর

শিক্ষার কেন্দ্রীয়করণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার হরণ করছে। সুরেন্দ্র রঘুবংশী বলেন, মধ্যপ্রদেশ সরকার ৯৪০০০ স্কুল বন্ধ করে দিয়ে পিপিপি মডেলে স্কুল চালু করছে।

অমিতাভ বসু বলেন, এই শিক্ষানীতি বিজ্ঞানবিরোধী ধ্যানধারণা বিকাশের নথি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাজাশেখর সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর বলেন, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি জাতীয় শিক্ষানীতির বিকল্প জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া প্রস্তুত করছে, যাকে একটি পিপলস পার্লামেন্টে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন এই ধরনা থেকে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য দেখা করতে চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রী সেই চিঠির কোনও উত্তর দেননি। ফলে স্মারকলিপিটি ই-মেল করে পাঠানো হয়।

জয়নগরে কর্মীসভা

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি ও স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধে, জাতীয় শিক্ষানীতি ও তার অনুসারী রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিল, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য, সমস্ত সরকারি শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে ২১ জানুয়ারি দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে কলকাতার হেদুয়া পার্ক থেকে মহামিছিল। মিছিল সফল করার লক্ষ্যে ৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার সক্রিয় কর্মীদের নিয়ে জয়নগরে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ সভা। সভা পরিচালনা করেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। সভায় রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com